প্রথম অধ্যায়

গণনাট্য সংঘ : সমসাময়িক রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ইতিহাসের প্রেক্ষিত বিংশ শতাব্দীর চারের দশক বাংলা ও বাঙালির কাছে ছিল এক অগ্নিপরীক্ষা। পঞ্চাশের মন্বন্তরে গ্রামের পর গ্রাম উজাড় হয়ে গিয়েছিল। শহরের ফুটপাথ জুড়ে শুধু অভুক্ত, অর্ধনগ্ন মানুষের ফ্যানের জন্য আর্ত চিৎকার। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও জাপানি বোমার আতঙ্কে শহর জনশূন্য। ১৯৪৩ সালের সেই অস্থির বিভ্রান্তির সময়ে 'ভারতীয় গণনাট্য সংঘ'-এর আবির্ভাব। গণনাট্য সংঘ নাটক, গান, নৃত্যসহ অন্যান্য শিল্পকলার মাধ্যমে বামপন্থী শ্রেণিচেতনার বক্তব্য ছড়িয়ে দেওয়ার দায়িত্ব নিয়েছিল। গণনাট্য সংঘ ঘোষণা করেছিল, "People's Theatre Stars the People"¹ যে নাট্য আন্দোলন জনতাকে 'তারকা' বানানোর শপথ নিয়েছিল, তার আবির্ভাবের কিছু পূর্ব ইতিহাস আছে। সমাজ-রাজনীতি-অর্থনীতির অশুভ আঁতাত আনুষ্ঠানিকভাবে ভারতীয় গণনাট্য সংঘ প্রতিষ্ঠার শুভ মুহূর্তকে ত্বরাম্বিত করেছিল। সুধী প্রধানের মতে,

"এই ইতিহাসের মশলা মিলবে ভারতের সাম্যবাদী আন্দোলনের জন্ম-বৃদ্ধি ও প্রসারতার

ইতিহাসের মধ্যে।"^২

গণনাট্যের প্রতিষ্ঠা প্রক্রিয়ার প্রেরণারূপে সর্বতভাবে ছিল ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহযোগিতা। ফলে গণনাট্য সংঘ প্রতিষ্ঠার রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ইতিহাসের প্রেক্ষাপট অনুসন্ধান করতে হলে আমাদের ইতিহাসের পূর্বাপর বিচার করতে হবে। তার সঙ্গে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি এবং কমিউনিস্ট আন্দোলনের প্রভাবাধীন সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল নিয়েও আলোচনা প্রয়োজন। সবশেষে চারের দশকের পূর্ববর্তী বাংলা থিয়েটারের গতিপ্রকৃতি কীভাবে গণনাট্য সংঘের প্রতিষ্ঠা অনিবার্য করে তুলেছিল তাও আমাদের বিচার্য বিষয় হয়ে উঠবে।

উত্তাল তিনের দশক :

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ (১৪১৪-১৮ খ্রি.) বাংলা বা ভারতবর্ষকে সরাসরি আক্রমণ করেনি। কিন্তু মুদ্রাস্ফীতির ফলে কলকাতায় দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পেল প্রায় একশো শতাংশ। ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক সামরিক খাতে ব্যয় বাড়ানোর পাশাপাশি শ্রমজীবী জনগণের উপর ট্যাক্সের পরিমাণ পঞ্চাশ শতাংশ বৃদ্ধি পেল।°

১৯১৮-তে রাওলাট আইন, ১৯১৯-এ জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড, ১৯১৯-এ মন্টেশু-চেমসফোর্ড সংস্কার ভারতবাসীকে ক্ষুব্ধ ও ক্রুদ্ধ করে তুলেছিল। ১৯২১-এ অসহযোগ প্রত্যাহার, ১৯৩২-এ গান্ধী-আরউইন চুক্তি কংগ্রেসি নেতৃত্বদের প্রতি মানুষের বিশ্বাসের ভিত নড়িয়ে দেয়। এদিকে প্রায় সমান্তরালভাবেই চলছিল অনুশীলন সমিতি, যুগান্তর সমিতির নেতৃত্বে গোপন সশস্ত্র সংগ্রামী কার্যকলাপ। ১৯২৯ সালে নিউইয়র্কের ওয়াল স্ট্রিটে আঘাত করল অর্থনৈতিক মহামন্দা (Great Depression)। সব মিলিয়ে বাঙালি যুবসমাজের মধ্যে দেখা দিল হতাশা, শৃন্যতা ও অবসাদ।

সেই বিমূঢ়-বিভ্রান্ত সময়ে বাঙালি যুবসমাজের চোখে বিশ্বকে মনে হয়েছিল 'The Waste land', আর ভিতর দিকে তাকিয়ে নিজেদের মনে হচ্ছিল,

"We are the hollow men

We are stuffed men

Leaning together."⁸

ফলে তার মন আকর্ষণ করল ফ্রয়েড-ইয়ুং-এর মনোবিকলন তত্ত্ব, শোপেনহাওয়ারের বিষাদচারণ। এই নতুন চৈতন্যের আলোয় নারী-পুরুষ, জননী-সন্তান, দেহ-মন, প্রেম-কাম নিয়ে ধারণাগুলি দ্রুত বদলে গেল। যুদ্ধোত্তর ইউরোপ থেকে প্রাপ্ত 'মনুষ্যত্বে শ্রদ্ধেয়তা, বাস্তব ও জনগণতান্ত্রিক চেতনা, যৌবনসংলগ্নতাবোধ মিথুনাসক্তি, প্রেমের মনস্তাত্ত্বিকতা, পারিবারিক ও সামাজিক সম্পর্কের পুনর্বিচারজাত নতুন মূল্যবোধ এবং দুঃখাত্মকতা ও বিষাদচেতনা'^৫ নিয়ে বাংলা সাহিত্যের নতুন পথ চলা শুরু হল। 'কল্লোল' (১৯২৩), 'কালিকলম' (১৯২৬) প্রভৃতি সাহিত্যগোষ্ঠীর হাতে প্রেম স্বর্গ থেকে নেমে এসে প্রবৃত্তির জটিল বেড়াজালে আবদ্ধ হল। ইদ্, ইগো, সুপার-ইগোর গোপন পদচারণা মানুযের অনুসন্ধিৎসু মনের আত্মপ্রকাশের সুপ্ত চেতনাকে মুখর করে তুলল। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, বিষ্ণু দে, প্রেমেন্দ্র মিত্র, বুদ্ধদেব বসু, যুবনাশ্ব (মণীশ ঘটক), মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ সাহিত্যিকদের 'কল্লোলিত কোলাহলে' বাস্তব জীবনের নানা অজানা গ্রন্থি বাংলা সাহিত্যের পাতায় আশ্রয় গ্রহণ করল।

১৯১৭ সালের নভেম্বরে রাশিয়াতে লেনিনের বলশেভিক পার্টির বিপ্লব ঘটে এবং 'সমাজতন্ত্র' প্রতিষ্ঠিত হয়। রাশিয়ার বিপ্লবের প্রতি কল্লোলের সাহিত্যগোষ্ঠীর সম্রদ্ধ কৌতৃহল ছিল। সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্যের প্রতি তাঁদের উদার মানবিক সহানুভূতি ছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সহানুভূতির চোখের জল চোখেই শুকিয়ে অর্থনৈতিক ও যৌন সমস্যার চোরাগলি খুঁজে নিয়েছিল। তার কারণ হিসেবে দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বলছেন, "সর্বহারা মানবতাবোধের মূলে রয়েছে বৈপ্লবিক সমাজতন্ত্রের আদর্শ। সেই আদর্শ সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞানের অভাবেই তাঁদের সাহিত্য দ্বন্দ্রহিত প্রকৃতিবাদের (Naturalism) পথে গেল।"^৬

রাশিয়ার বিপ্লবের পর ভারতবর্ষের মাটিতে সর্বহারা মানবতার বাণী খুব দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছিল। বিশেষ করে এ দেশের মেহনতি মানুষের অবদমিত প্রতিবাদী চেতনা নানা দাবিদাওয়া পূরণের লক্ষ্যে ধর্মঘটের পথে প্রকাশিত হচ্ছিল। ১৯১৯ সালে কুখ্যাত রাওলাট আইনের প্রতিবাদে শ্রমিকশ্রেণিও সামিল হয়।^৭ ১৯২০ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় 'সারা ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস'।^৮ এ বছরের ১৭ অক্টোবর কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের দ্বিতীয় কংগ্রেসের পর সোভিয়েত ইউনিয়নের তাশখন্দ শহরে (বর্তমানে উজবেক প্রজাতন্ত্রের রাজধানী) নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য ওরফে মানবেন্দ্রনাথ রায় এবং আরও কয়েকজনের নেতৃত্বে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়।^৯ ১৯২১ সালের ডিসেম্বরে আমেদাবাদে কমিউনিস্ট পার্টির উদ্যোগে কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনে গোপনে প্রথম মুদ্রিত ইস্তাহার বিতরণ করা হয়। যার বক্তব্য ছিল, "কোনো ব্যক্তিবিশেষের খামখেয়ালে কোনো নির্দিষ্ট তারিখে স্বরাজ আসবে না, স্বরাজ অর্জন করতে হবে সর্বস্তরের সচেতন মানুষের সম্মিলিত চেষ্টায়"।^{১০} বিভিন্ন শ্রমিক ইউনিয়ন, ছাত্র-যুব আন্দোলনের মানুষ এই নতুন মতবাদে বিশ্বাসী হতে গুরু করে। ১৯২৮ থেকে ১৯৩০ সালের মধ্যে ভারতবর্ষের বিভিন্ন অংশে বিশেষত কলকাতায় শ্রমিক আন্দোলন লক্ষ করা যায়।

১৯২৯ সালের ২০ মার্চ ব্রিটিশ সরকার মিরাট ষড়যন্ত্র মামলায় ৩১ জন কমিউনিস্ট নেতাকে গ্রেপ্তার করে। এই মামলা ছিল 'পৃথিবীর দীর্ঘতম ও বৃহত্তম রাম্ব্রীয় বিচার'।^{১১} কিন্তু এই মামলার সুযোগে অভিযুক্তরা বামপন্থার সূত্র ব্যাখ্যা করতে থাকেন। মার্কসবাদের এই 'এজিট-প্রপ'^{১২} মঞ্চাভিনয়

সচেতন মানুষকে আরও বেশি করে মার্কসবাদের দিকে আকৃষ্ট করে। জেলবন্দী স্বাধীনতা সংগ্রামীরা জেলের মধ্যে থেকে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের 'ক্লাস' নিয়ে বাইরে আসেন। এরই মধ্যে ১৯৩৪ সালের ২৩ জুলাই কমিউনিস্ট পার্টিকে নিষিদ্ধ করা হয়।^{১৩}

এদিকে ১৯৩৩ সালে হিটলার ও তার নাৎসি পার্টি জার্মানির ক্ষমতা দখল করে। নাৎসিবাদের সেই তাওবলীলায় দেশত্যাগী হলেন হাজার হাজার বৈজ্ঞানিক, স্বাধীন চিন্তাবিদ, সাহিত্যিক ও দার্শনিক। রাইখস্ট্যাগ মামলায় কমিউনিস্টদের নিপীড়নের পর হিটলার শুরু করলেন ইহুদি-নিধন যজ্ঞ। যা আরও পরে 'Holocaust'-এর রূপ নেবে। তার উদগ্র সাম্রাজ্যলালসার সঙ্গী হলেন ইতালির বেনিটো মুসোলিনি। বিশ্বের সমস্ত শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ এই দানবকে প্রতিরোধ করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলেন। ১৯৩৫ সালে কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনালের সপ্তম অধিবেশনে ফ্যাসিস্ট-বর্বরতা ও আসন্ন বিশ্বযুদ্ধের মুখোমুথি হওয়ার রণকৌশল তৈরি করা হয়। এ-বছরের ২ আগস্ট Georgi Dimitrov-এর তৈরি করা 'The Fascist Offensive and Tasks of the Communist International in the Struggle of the Working Class against Fascism' নামক একটি থিসিস প্রকাশ করা হয়।^{১৪} যা 'যুক্তফ্রন্ট থিসিস' নামেও পরিচিত ছিল।^{১৫} যেখানে কমিউনিস্ট, সোশ্যালিস্ট, সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাট, পেটি-বুর্জোয়া সমস্ত ফ্রন্টের ছাত্র-শ্রমিক-কৃষক-বুদ্ধিজীবীদের ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে একত্রে লড়াইয়ের জন্য ফ্রন্ট গঠনের ডাক দেওয়া হয়। ভারত্বর্য্বেও ১৯৩৬ সালে রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক উভয় ক্ষেত্রেই সাম্যবাদী আন্দোলন বিস্তারের ক্ষেত্রে কমিউনিট পার্টিকে কয়েকটি পৃথক শ্রেণিগত সংগঠনের সাহায্য নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়।^{১৬}

প্রগতি লেখক সংঘ :

১৯৩৫-১৯৩৬-এ মুসোলিনি আবিসিনিয়া দখল করে তাদের ক্ষমতা অভিযানের প্রথম পদক্ষেপ রাখা শুরু করে।^{১৭} ১৯৩৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে স্পেনের ফ্যাসিস্ট দল 'ফ্যালাঙ্কস'-কে সাংবিধানিকভাবে হারিয়ে জনগণের সংযুক্ত মোর্চা বা পপুলার ফ্রন্ট ক্ষমতা দখল করেছিল। কিন্তু ১৭ জুলাই জেনারেল

ফ্রান্সিসকো ফ্র্যাক্কোর নেতৃত্বে মরক্কো (তৎকালে স্পেনের দখলে), বার্সেলোনা, সেভিয়াসহ স্পেনের বিভিন্ন শহরে ঘটল ফ্যাসিস্ট অভ্যুত্থান। হত্যা করা হল কবি ফেদেরিকো গার্সিয়া লোরকাকে। কারাবাসে মৃত্যু হল মিগুয়েল হার্নান্দেজসহ অসংখ্য শিল্পীর। দেশত্যাগ করলেন কবি রাফায়েল আলবেরতি। প্রিয় বন্ধু লোরকার মৃত্যুতে পাবলো নেরুদা লিখলেন,

> "That's the way life is, Federico, here you have the things that my friendship can offer you, the friendship of a melancholy manly man. By yourself you already know many things,

and others you will slowly get to know."^{3b}

স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল স্পেনে পশুশক্তির উত্থান আসলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মহড়া। স্পেনের পপুলার ফ্রন্টের আহ্বানে তৈরি হল আন্তর্জাতিক ব্রিগেড। বিশ্বের চুয়ান্নটি দেশ থেকে প্রায় ৪২০০০ শান্তিকামী ও প্রগতিশীল মানুষ স্পেনের প্রত্যক্ষ রণাঙ্গনে ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করলেন। ১৯৩৭ সালের ২৬ এপ্রিল ফ্র্যাক্ষো বাস্ক প্রদেশের গোয়ের্নিকা শহরটি হিটলারকে তার নবনির্মিত শক্তিশালী বোমা পরীক্ষার জন্য ছেড়ে দেয়। সাড়ে তিন ঘন্টার মধ্যে সমস্ত শহরটি ধ্বংস করে দিয়ে হিটলার ও তার 'falangist force' সমগ্র বিশ্বকে বিহ্বল করে দেয়। এই ঘটনার প্রতিবাদে পাবলো পিকাসো 'গোয়ের্নিকা' ছবিটি সৃষ্টি করেন।

এই বিপদকে প্রতিহত করার জন্যই প্রস্তুত হচ্ছিলেন দেশ-বিদেশের বুদ্ধিজীবীরা। ১৯৩৫ সালের ২১ জুন আঁদ্রে জিদ, আঁরি বারবুস, রঁম্যা রলাঁর নেতৃত্বে প্যারিসে শিল্পী সাহিত্যিকদের প্রথম আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ম্যাক্সিম গোর্কি, টমাস মান, ই এম ফস্টার, আঁদ্রে মারলো, অলডাস হ্যাক্সলি প্রমুখ আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন লেখক-বুদ্ধিজীবীরাও এই সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন।^{১৯} সেখান থেকেই গড়ে ওঠে 'International Association of Writers for the

Defence of Culture against Fascism' সংগঠনটি। প্রায় সমকালেই সংগঠিত হয় 'League Against Fascism & War'। শুধু শিল্পী-সাহিত্যিকরা নয়, এই মঞ্চের প্রত্যক্ষ সদস্য হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছিল শ্রমিক-কৃষক সংগঠনের প্রতিনিধি এবং প্রগতিশীল রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গকেও।^{২০}

প্যারিস সম্মেলনের কিছুদিন পর ইংল্যান্ডে কয়েকজন ভারতীয় ও ব্রিটিশ লেখকদের মিলিত উদ্যোগে একটি প্রগতি সাহিত্য সংঘ গঠিত হয়। যার সদস্য ছিলেন মুলুকরাজ আনন্দ, রজনীপাম দত্ত, সাজ্জাদ জহির, হ্যারন্ড ল্যাস্কি, ই এম ফস্টার প্রমুখ ব্যক্তিত্বরা। সশরীরে উপস্থিত না থেকেও হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ প্রমুখ ব্যক্তির উৎসাহ ও উদ্যোগ তাঁদের সঙ্গে সবসময়ই ছিল।^{২১} ১৯৩৬ সালের এপ্রিল মাসে লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসে জওহরলাল নেহরুর ভাষণেও ফ্যাসিবাদ বিরোধী তাবনা প্রকাশ পায়।^{২২} ১০ এপ্রিল লক্ষ্ণৌতে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় 'নিখিল ভারত প্রগতি লেখক সংঘ' (All India Progressive Writers' Association)। সভাপতি হন মুন্সী প্রেমচাঁদ এবং সাধারণ সম্পাদক হন সাজ্জাদ জহির।^{২০} সম্মেলনে যোগ দেন সরোজিনী নাইডু, উর্দু লেখক মৌলানা হসরৎ মোহানী প্রমুখ। এর কিছুকালের মধ্যে কলকাতা, এলাহাবাদ, দিল্পি, আলিগড়, বোম্বাই, পুনে, দেরাদুন প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ শহরে প্রগতি লেখক সংঘের শাখা গঠিত হয়। এ-বছরের ১৮ জুন ম্যাক্সিম গোর্কির মৃত্যু হয়। তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য ১১ জুলাই কলকাতার অ্যালবার্ট হলে একটি সভার আয়োজন করা হয়। সেই সভা থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে 'বঙ্গীয় প্রগতি সংঘ'-এর আত্মপ্রকাশ হয়। সভাপতি হন নরেশচন্দ্র সেন্ডগ্ত এবং সম্পাদক সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী।^{২৪}

১৯৩৬ সালে লন্ডনে 'League Against Fascism & War'-এর দ্বিতীয় সম্মেলনে মুলুকরাজ আনন্দ প্রতিনিধিত্ব করেন।^{২৫} ১৯৩৮ সালের ডিসেম্বর মাসে কলকাতার আশুতোষ কলেজ হলে অনুষ্ঠিত হয় 'নিখিল ভারত প্রগতি লেখক সংঘ'-এর দ্বিতীয় সম্মেলন। তৃতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৪৩ সালের মে মাসে বোম্বাই শহরে। এই সম্মেলন থেকেই 'ভারতীয় গণনাট্য সংঘ' আনুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

'নিখিল ভারত প্রগতি লেখক সংঘ'-এর পক্ষ থেকে ১৯৩৬ সালের ২৮ জুন (১৪ আষাঢ়, ১৩৪৩ বঙ্গান্দ) আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রচারিত ঘোষণাপত্রে তাঁদের আদর্শ ও কর্মনীতির বিস্তৃত ব্যাখা ছিল,

"যা কিছু আমাদের নিশ্চেষ্টতা, অকর্মণ্যতা, যুক্তিহীনতার দিকে টানে, তাকে আমরা প্রগতি-বিরোধী বলে প্রত্যাখ্যান করি। যা কিছু আমাদের বিচার-বুদ্ধিকে উদ্বুদ্ধ করে, সমাজ-ব্যবস্থা ও রীতিনীতিকে যুক্তিসম্মতভাবে পরীক্ষা করে, আমাদের কর্মিষ্ঠ, শৃঙ্খলাপটু, সমাজের রূপান্তরক্ষম করে, তাকে আমরা প্রগতিশীল বলে গ্রহণ করব।"^{২৬}

১৯৩১ সালে সুধীন্দ্রনাথ দত্ত সম্পাদিত 'পরিচয়' পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকাকে কেন্দ্র করেই মার্কসীয় যুক্তি-বিজ্ঞানে দীক্ষিত সাহিত্যিকদের আবির্ভাব ঘটে। 'পরিচয়'-এর পাতায় সুশোভন সরকারের ধারাবাহিক লেখনীতে 'রুশ বিপ্লবের পটভূমি', 'রুশ বিপ্লবের ইতিবৃত্ত' প্রভৃতি প্রকাশিত হতে থাকে।^{২৭} ১৯৩১ সালে রাশিয়া ভ্রমণকালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিপ্লবোত্তর রাশিয়ার সাক্ষী হয়ে লিখলেন,

"যারা মূক ছিল তারা ভাষা পেয়েছে, যারা মূঢ় ছিল তাদের চিত্তের আবরণ উদ্ঘাটিত, যারা অক্ষম ছিল তাদের আত্মশক্তি জাগরূক, যারা অবমাননার তলায় তলিয়ে ছিল, আজ তারা সমাজের অন্ধকুটুরী থেকে বেরিয়ে এসে সবার সঙ্গে সমান আসন পাবার অধিকারী"।^{২৮}

১৩৩৯ বঙ্গান্দে 'পরিচয়' পত্রিকায় প্রকাশিত ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের 'অথ কাব্য জিজ্ঞাসা' প্রবন্ধটি ছিল মার্কসবাদের মূল সূত্রের ব্যাখ্যায় পরিপূর্ণ। এর কিছুকাল পরে হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় 'পরিচয়'-এর লেখকগোষ্ঠীতে যোগ দেন। ১৯৩৩ সালে নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের অনুবাদে প্রকাশিত হল গোর্কির 'মা' উপন্যাস। ১৯৩৮ সালে মনোরঞ্জন হাজরার কৃষক-সংগ্রাম ভিত্তিক 'নোঙরহীন নৌকা' এবং গোপাল হালদারের সশস্ত্র সংগ্রামী থেকে মার্কসবাদে উত্তরণের কাহিনি নিয়ে 'একদা'

উপন্যাস দুটি প্রকাশের পর বাংলা সাহিত্যে লাল রঙের আভা আরও একটু গাঢ় হয়।^{২৯} সেই সময়ের উত্তাল আন্তর্জাতিক রাজনীতি বাংলায় বামপন্থী সাহিত্যচিন্তার বিকাশে অন্যতম সহায়ক হয়ে উঠেছিল।

১৯৩৭ সালে প্রগতি লেখক সংঘ কর্তৃক প্রকাশিত 'Towards Progressive Literature' এবং সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী ও হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত 'প্রগতি' সংকলন দুটি প্রগতিশীল সাহিত্যকে মার্কসীয় চিন্তাচর্চার সঙ্গে দৃঢ় যোগসূত্র তৈরি করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল।^{৩০} যা উৎসর্গ করা হয়েছিল 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বরণীয়েষু'-কে এবং যার গুরুতেই ছিল রবীন্দ্রনাথের 'প্রশ্ন' কবিতাটি।^{৩১} গ্রন্থে ভূপেন্দ্রনাথ দন্ত, বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামীর লেখায় 'Arts for Arts Sake'-এর বুলিকে বিদায় এবং বাংলা সাহিত্যে 'Realism'-এর জয়ধ্বজা ওড়ানোর কথাও দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে বলা হয়েছিল।^{৩২} ১৯৩৯ সালের জানুয়ারিতে প্রকাশিত হয় 'অগ্রণী' মাসিক পত্রিকা। 'অগ্রণী' বাংলা ভাষায় কমিউনিস্ট পার্টির নির্দেশে পরিচালিত প্রথম সাংস্কৃতিক পত্রিকা।^{৩৩}

প্রগতি লেখক শিল্পী সংঘের প্রতিষ্ঠা থেকে 'অগ্রণী' প্রকাশের সময়কালের মধ্যে বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতিতে সাম্যবাদী বিচার বিবেচনা ও অনুশীলন চূড়ান্ত নির্ণায়ক রপ নেয়। প্রগতি লেখক সংঘের ঘোষণাপত্রটি বাংলা সাহিত্যের বাঁকবদলে গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় সংযোজন করে। সাহিত্য-সংস্কৃতিকে সমাজের মুষ্টিমেয় অংশের রোমান্টিক ভাববিলাসের বদলে বৃহত্তর শ্রেণির সামাজিক প্রগতি ও উন্নতির হাতিয়ার করার চেষ্টা শুরু হল। পোক্ত হল শ্রেণিসংগ্রামের ধারণা। বাংলা সাহিত্যে অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক-সামাজিক বৈষম্যের ছবি উঠে এল বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গির নিরিখে। এই সময় থেকেই বাংলা সাহিত্য ঘোষিত হয় 'সমাজতান্ত্রিক বান্তবতা'-র (Socialist Realism) বাণী। 'বুর্জোয়া রোমান্টিসিজম'-এর অধরা মাধুরী লাভ নয়, ইউটোপিয়ান (Utopian) সমাজের আকাশ-কুসুম কল্পনা নয়, ক্রিটিকাল রিয়ালিজমের (Critical Socialism) সমালোচনার বাগাড়ম্বর নয়; বিপ্লবের পথে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা এখন আর স্বপ্ন নয়, বাস্তব। সাহিত্যকে তার সহকর্মী হয়ে ওঠার দায়িত্ব নিতে হবে। সাহিত্য শুধু 'বুর্জোয়া রিয়ালিস্ট'-এর মতো হুবহু বর্ণনা দেবে না। সে বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদের সাহায্যে পৃথিবীকে বদলে ফেলার দিনলিপি তৈরি করবে। এই 'দ্য গ্রেট রিয়ালিজম' অবশ্যই রোমান্টিক হবে, কিন্তু তার চোখে থাকবে আগত সুন্দর সমাজতন্ত্রের প্রতিচ্ছবি।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ—'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন, 'জনযুদ্ধ' নীতি এবং পঞ্চাশের মন্বন্তর :

১ সেপ্টেম্বর, ১৯৩৯; দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের রণদামামা বাজিয়ে হিটলার পোল্যান্ড আক্রমণ করে। ইংল্যান্ড ও ফ্রান্স পোল্যান্ডকে রক্ষা করতে এগিয়ে আসে। ৩ সেপ্টেম্বর মিত্রবাহিনী জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। শুরু হয় মানব ইতিহাসের সব থেকে ভয়ন্ধর যুদ্ধ। একদিকে ফ্যাসিস্ট নৃশংসতার শিরোমণি হিটলার-মুসোলিনি, অন্যদিকে 'বিশ্বশান্তি'র নামাবলি গায়ে জড়ানো সাম্রাজ্যবাদের অধীশ্বর ইংল্যান্ড-ফ্রান্স। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ থেকে ভারতবর্ষ খানিকটা দূরেই ছিল। কিন্তু এবারের যুদ্ধে ভারতবর্ষ সরাসরি জড়িয়ে পড়ে। যুদ্ধকালীন সময়ে ইংরেজ সরকার ভারতের জনসাধারণ ও তার ঐতিহ্যের মূল্য দেওয়ার কথা ভাবেনি। যুদ্ধ ঘোষণার পরদিনই বড়লাট লিনলিথগো ১৯৩৫ সালের 'ইন্ডিয়া অ্যাক্ট'-এর যুক্তরাষ্ট্রীয় গঠনের অংশটুকু ঢাল করে ভারতকে 'যুদ্ধরত দেশ' বলে ঘোষণা করে।^{৩৪} আক্ষরিক অর্থেই যুদ্ধকালীন তৎপরতায় জারি হল 'ভারতরক্ষা আইন'। ১৯৩৯-এর ২ অক্টোবর মুম্বইতে ৪০-টি কারখানার ৯০ হাজার শ্রেমিক যুদ্ধের বিরুদ্ধে 'রাজনৈতিক ধর্মঘট'-এ সামিল হলেন।^{৩৫} ১৪ সেপ্টেম্বর কঠোর ভাষায় কংগ্রেসের পক্ষ থেকে বিবৃতি আসে,

"স্থিতাবস্থা বজায় রাখাই যদি এ যুদ্ধের উদ্দেশ্য হয় এবং সাম্রাজ্যবাদীদের ঔপনিবেশিক অধিকার, কায়েমি স্বার্থ ও সুবিধা যদি এ যুদ্ধের মাধ্যমে অক্ষুণ্ণ থাকে তা হলে এ যুদ্ধের সঙ্গে ভারতবর্ষের কোনো সম্পর্ক নেই। তবে গণতন্ত্র এবং গণতন্ত্র কেন্দ্রিক বিশ্বরাজনীতি যদি যুদ্ধের মূল প্রশ্ন হয়, সে ক্ষেত্রে ভারতবর্ষের উৎসাহের কোনো অভাব নেই।... ব্রিটিশ সরকারকে কার্যকরী সমিতি তাই আহ্বান জানাচ্ছে তাঁরা দ্ব্যর্থহীনভাবে বলুন গণতন্ত্র এবং সাম্রাজ্যবাদের ক্ষেত্রে তাঁদের যুদ্ধ-লক্ষ্য কী, এবং কী ধরণের নতুন ব্যবস্থার কথা তাঁরা ভাবছেন।"^{৩৬}

এর প্রায় একমাস পরে ১৭ অক্টোবর ভাইসরয়ের পাঠানো উত্তর ভারতবর্ষের ভবিষ্যতের পক্ষে সন্তোষজনক ছিল না। যুদ্ধ শেষে 'কয়েকটি সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনার পর ভারতকে ডোমিনিয়ন মর্যাদা দেওয়া হবে' জাতীয় নিরর্থক, অস্পষ্ট সান্ত্বনা ছুড়ে দেওয়া হয়।^{৩৭} ১৯৪০-

এর মাঝামাঝি সময়ে ইংল্যান্ডে ক্ষমতায় আসেন উইনস্টন চার্চিল। ততদিনে ইউরোপের বিভিন্ন প্রান্তে ইংরেজদের শোচনীয় পরাজয় ঘটেছে, ফ্রান্স পদানত হয়েছে। ১৯৪০-এর ১১ অক্টোবর কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি নিজেদের যুদ্ধবিরোধী অবস্থান প্রমাণ করার জন্য ব্যক্তিগত আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করে। জুন ১৯৪১-এর মধ্যে প্রায় ২০,০০০ জন কারাবরণের পর আন্দোলনে ভাঁটা পড়ে।^{৩৮}

১৯৪১-এর জুনে হিটলার জার্মান-সোভিয়েত অনাক্রমণ চুক্তিকে (১৯৩৯) অগ্রাহ্য করে রাশিয়া আক্রমণ করে। ডিসেম্বরে জাপান দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ঢুকে পড়ে মালয়, সিঙ্গাপুর ও ব্রহ্মদেশ দখল করে নেয়। যুদ্ধ ক্রমশ ভারতে ঢুকে পড়ার আশঙ্কায় ইংরেজ সরকার মরিয়া হয়ে ভারতের সমর্থন পাওয়ার আশায় ১৯৪২-এর মার্চ মাসে 'ক্রিপস মিশন' পাঠাতে বাধ্য হয়।^{৩৯} আগস্ট মাসে গান্ধীজি তাঁর চিরাচরিত মূর্তি ত্যাগ করে আচমকাই 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের সিদ্ধান্ত নেন। তাঁর যুক্তি ছিল, প্রতিরক্ষার বোধ ও দায়িত্ব ভারতবাসীর নিজেকেই নিতে হবে। সময় অনুকূল নয় জেনেও তিনি বলেন,

"আমার ধারণা এ যুদ্ধে আমার যদি কোনো অবদান থাকে এই সে অবদান, ভারতবর্ষকে সর্বনাশের হাত থেকে রক্ষা করার এটাই আমি উপায় মনে করি; এটার মূল্য আমার কাছে এইজন্য এত বেশি।"⁸⁰

১৯৪২ সালের ৮ আগস্ট এআইসিসি-র বোম্বাই অধিবেশনে 'ভারত ছাড়ো'-র প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। গান্ধীজি ডাক দিলেন 'করেন্ধে ইয়া মরেঙ্গে'। সেদিন রাতেই গান্ধীজিসহ কার্যকরী সমিতিকে গ্রেপ্তার করা হয়। ফলে 'ভারত ছাড়ো' প্রস্তাব ও নেতৃবৃন্দের গ্রেপ্তারের খবর একই সঙ্গে ৯ আগস্ট সকালে সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়ল। সারা দেশে হরতাল পালিত হল, বিক্ষোভে আর মিছিলে জীবনযাত্রা অচল হয়ে গেল। স্কুল-কলেজ-কারখানায় ধর্মঘট শুরু হল; ব্রিটিশ-শাসনের প্রতীক বলে থানাগুলি ধ্বংস করে ফেলা হল। টেলিগ্রাফের তার কেটে দেওয়া হল, উড়িয়ে দেওয়া হল রেল লাইন, কৃষকরা খাজনা দেওয়া বন্ধ করে দিল। মেদিনীপুরের তমলুক, মহারাষ্ট্রের সাতারা, ওড়িশার তালচেরসহ বিভিন্ন জায়গায় গঠিত হল 'জাতীয় সরকার'। তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকার গঠন করা

হয়েছিল ১৭ ডিসেম্বর। পরে সুতাহাটা, নন্দীগ্রাম ও মহিষাদলেও তা সম্প্রসারণ করা হয়। ১৯৪৪-এর সেপ্টেম্বর পর্যন্ত 'তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকার' টিঁকে ছিল।^{৪১}

বিদ্রোহ যত তীব্র হয়ে উঠছিল, তত নির্মম হচ্ছিল ব্রিটিশ অত্যাচার। লাঠিচালনা, গুলি বর্ষণ, গ্রেপ্তার, হত্যা—ভারতবর্ষে সে সময়ে যেন জঙ্গলের রাজত্ব চলছে। এমনকি আকাশ থেকে মেশিনগানে গুলি চালিয়ে নিরস্ত্র জনতাকে নির্বিচারে হত্যা করা হয়। ১৯৪৩-এর শেষে গ্রেপ্তারির সংখ্যা ছিল মোট ৯১,৮৩৬। পুলিশ ও সেনাবাহিনীর গুলিতে মৃত্যুর সংখ্যা অনেক কমিয়েও প্রায় ১১০০। আহত অগণিত। সবচেয়ে ভয়ানক এই সময়কালে তমলুক মহকুমায় মোট ৭৪টি ধর্ষণের ঘটনা তালিকাভুক্ত করা হয়।^{৪২} এই রকম নারকীয় বর্বরতার সামনে নিরস্ত্র, অসংগঠিত, নেতৃত্বহীন জনতা হার মানতে বাধ্য হয়। অবশেষে ১৯৪৪-এর ৬ মে গান্ধীজি জেলমুক্ত হয়ে আইন-অমান্য প্রত্যাহার করে বিদ্রোহের সমাপ্তিতে শিলমোহর দেন।^{৪৩} কিন্তু মাতঙ্গিনী হাজরার মতো বহু মানুষের মহান আত্মত্যাগ স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত হয়। এবং দেওয়াল লিখনের মতো এটাও স্পষ্ট হয়ে যায় যে ভারতবর্ষে ব্রিটিশ সূর্যের পশ্চিমে ঢলে পড়া সময়ের অপেক্ষা মাত্র।

'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের আবহ থেকে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি স্পষ্ট দূরত্ব বজায় রেখে অবস্থান করেছিল। এমনকি একে 'জাতীয় সংকট' বলেও উল্লেখ করেছিল। সিপিআই জনগণের স্বতঃস্ফূর্ততার মধ্যে 'পঞ্চম বাহিনী'-র হাত দেখতে পায়।⁸⁸ এর কারণ ছিল কমিউনিস্ট পার্টির 'জনযুদ্ধ নীতি'। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রারম্ভে ভারতে নিষিদ্ধ অবস্থা সত্ত্বেও কমিউনিস্ট পার্টি সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী অবস্থান নিয়েছিল। কিন্তু ১৯৪১-এর জুন মাসে হিটলারের আক্রমণের পর রাশিয়া মিত্রশক্তির সঙ্গে যুক্ত হওয়ায় পার্টির মধ্যেও দ্বিধা ও বিতর্কের সূচনা হয়। দেউলি-র জেলে বন্দী কমিউনিস্ট নেতৃত্ব এই সময় 'জনযুদ্ধ'-এর দলিল প্রস্তাব করে। যার সার কথা ছিল, "(১) হিটলার কর্তৃক সোভিয়েত আক্রমণের পর থেকে মহাযুদ্ধ জনযুদ্ধে পরিণত হয়েছে, (২) ভারতবাসীর কর্তব্য বিনাশর্তে এই যুদ্ধে সহযোগিতা করা।"⁸⁰

১৯৪২ সালের ফেব্রুয়ারিতে কেন্দ্রীয় কমিটি কর্তৃক প্রচারিত 'Forward to Freedom'-এ অত্যন্ত দুর্বোধ্য ও অবাস্তব ভঙ্গীতে 'জনযুদ্ধ'-এর সঙ্গে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামকে মেলানোর এক পরস্পরবিরোধী তত্ত্ব খাড়া করা হয়। পার্টি-নির্বিশেষে সকল জনতার কাছেই এই প্রস্তাব ধিক্কৃত হয়। ফলে আগস্ট আন্দোলনের কালে কংগ্রেস নেতৃত্ব যখন জেলে, তখন ভারতীয় রাজনীতির ফাঁকা ময়দানকে কমিউনিস্ট পার্টি ব্যবহার করতে পারেনি। বরং 'আজাদ হিন্দ ফৌজ'-এর সবার্ধিকারী সুভাষচন্দ্র বসুকে কুইসলিং (Quisling- নরওয়ে-জাত এই শব্দের অর্থ বিশ্বাসঘাতক) বলে ও 'People's War' পত্রিকায় তাঁকে নিয়ে কার্টুন তৈরি করে শুধু ঘৃণা কুড়িয়েছিল। 'এম এন রায় পন্থী', ফরওয়ার্ড ব্লক, কংগ্রেস প্রতিটি দলই কমিউনিস্ট পার্টিকে বিশ্বাসঘাতক ও 'ইংরেজের চর' বলে চিহ্নিত করে। ১৯৪২-এর ২২ জুলাই আন্তর্জাতিক ভাবচুক্তির দাবিতে নিষেধাজ্ঞা উঠে গেলে বিরোধীদের বক্তব্য আরও জোরদার হয়। তৎকালীন পার্টি নেত্রী মণিকুন্তলা সেন তাঁর 'সেদিনের কথা' গ্রন্থে সেই সময়ের দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ও ব্যর্থতো সম্বন্ধে লিখছেন,

"আমাদের পক্ষেও এই নতুন লাইন নিয়ে প্রচারে নামা কম কঠিন কাজ ছিল না। সাধারণ লোককে এই আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি ও ফ্যাসিস্ট-বিরোধী সংগ্রামের উচিত্য সম্পর্কে বোঝাতে আমরা সত্যিই হিমসিম খেতাম। কাল যেখানে বলেছি—'এ যুদ্ধে একটি মানুষ, কিংবা একটি পয়সা নয়', আজই আবার কী করে বোঝাই—'এ যুদ্ধ জনযুদ্ধ'!"^{8৬}

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বাংলার বুকে নিয়ে এসেছিল এক ভয়ানক মৃত্যুমিছিল। যাকে আমরা জানি 'পঞ্চাশের মন্বন্তর' নামে। ১৯৪৩ খ্রি. বা ১৩৫০ বঙ্গাব্দের সেই মহামন্বন্তরে শ্মশান হয়ে গিয়েছিল সাধের রূপসী বাংলা। ১৯৪২ সালের ২০ ডিসেম্বর কলকাতায় জাপানিরা বোমাবর্ষণ করে। ভীত ইংরেজ সরকার তার আগেই 'ডিনায়াল পলিসি' ও 'পোড়ামাটির নীতি' চালু করেছিল। একদিকে সাধারণ মানুষের শস্যভাণ্ডার ধ্বংস করে দেওয়া হয়, অন্যদিকে ইংরেজ সৈন্যদের জন্য জোরপূর্বক খাদ্যশস্য সংগ্রহ শুরু হয়। দেশীয় কালোবাজারি, মুনাফাবাজ শকুনের দল এই সুযোগ গ্রহণ করে হূর্তিম খাদ্যসংকট তৈরি করে। ১৯৪২-এর অক্টোবরে মেদিনীপুরসহ দক্ষিণবঙ্গের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ঘূর্ণিঝড়, অতিবৃষ্টি, বন্যায় প্রচুর মানুষ মারা যান। নষ্ট হয়ে যায় কার্তিকের ফসলভরা ধানক্ষেত।

বাংলায় ক্ষমতাসীন ফজলুল হক সরকার ও পরে সোহরাবর্দি সরকারের নিশ্চেষ্টতা মম্বন্তরকে অনিবার্য ভবিতব্য করে তুলেছিল। শহরের ফুটপাথে দেখা গেল ডাঁই করা মৃতদেহের স্তুপ। ডাস্টবিন থেকে কুকুরের সঙ্গে একত্রে উচ্ছিষ্ট খুঁটে যাচ্ছে কঙ্কালসার দেহের দল। শহরের রাস্তায় ক্ষুধার্ত মানুষের দুর্বল কণ্ঠে 'ফ্যান দাও'-এর অসহায় আর্তনাদ। মৃত মায়ের শুষ্ক স্তন থেকে খাদ্যের আশায় মুখ ডুবিয়ে পড়ে আছে মৃতপ্রায় শিশু। লঙ্গরখানায় গ্রুয়েলের জন্য অপেক্ষারত মরা মাছের মতো চোখ। এই মন্বন্তরে মারা গেলেন ৩৫-৫০ লক্ষ মানুষ। কিন্তু তার চেয়েও বড়ো হয়ে দেখা দিল সামর্থ্যবান মানুষের বর্বরতা-নিষ্ঠুরতা-অবহেলা। যেটা অনেক বেশি লজ্জার।

সদ্য নিষেধাজ্ঞা মুক্ত কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষ থেকে পিপলস রিলিফ কমিটি বা পিআরসি তৈরি করা হয়েছিল। ডিসেম্বরে সাইক্লোনে ক্ষতিগ্রস্থ মানুষদের সেবার্থে তৈরি হল পিপলস সাইক্লোন রিলিফ কমিটি।⁸⁹ কমিউনিস্ট পার্টি প্রকাশ করল 'মৃত্যু ও মহামারির বিরুদ্ধে খাদ্যের জন্য লড়ো' পুস্তিকা। যেখানে বলা হয়েছিল,

"বাংলা মরিতে পারে না, বাংলাকে বাঁচিতেই হইবে। বাংলাকে বাঁচাইবার উপরে নির্ভর করে ভারতের স্বাধীনতা, বাংলাকে বাঁচানই আজ শ্রেষ্ঠ স্বদেশ সেবা।"^{8৮}

'মহামারির হাত থেকে বাংলাকে বাঁচাও মেডিক্যাল স্কোয়াড গঠন কর' পুস্তিকায় কীভাবে এই অবস্থার মোকাবিলা করা যায় তার নীল-নকশা প্রস্তুত করা হয়েছিল। সম্বল ছিল ৯০০ জন পার্টি সদস্য, ১৮০০ জন এ-জি সদস্য, ২৫০টি জনরক্ষা সমিতি, দশ হাজার স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী। জাতীয় কংগ্রেস আগস্ট আন্দোলনের ফলে জেলবন্দী থাকলেও মুসলিম লিগ বা হিন্দু মহাসভা কিন্তু স্বতঃস্ফূর্তভাবে দুর্ভিক্ষ মোকাবিলায় এগিয়ে আসেনি। জনযুদ্ধ নীতির ফলে কমিউনিস্ট পার্টি জনতার ধিক্কারের সম্মুখীন হয়েছিল। দুর্ভিক্ষের সময় যেন সেই ভুলের ক্ষতিপূরণ করল। যে প্রসঙ্গে সেদিনের ছাত্রনেতা কমল চ্যাটার্জির বক্তব্য অপ্রিয় হলেও সত্য, "তেতাল্লিশের দুর্ভিক্ষ আমাদের কাছে যেন দেবতার আশির্বাদের মতো।"⁸⁸

ওয়াইসিআই, সোভিয়েত সুহৃদ সংঘ ও ফ্যাবিলেশিস :

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূত্রপাতে পার্টির বিপদকালে প্রগতি লেখক সংঘের কাজে বিরাট শূন্যতা সৃষ্টি হয়েছিল। সেই শূন্যস্থান পূরণ করার লক্ষ্যে ১৯৪০-এর ফেব্রুয়ারি মাসে বামপস্থী ছাত্র-যুব-বুদ্ধিজীবীরা ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে আলোচনার মাধ্যমে ইউথ কালচারাল ইন্সটিটিউট [Youth Cultural Institute (YCI)]-এর প্রস্তাব প্রাথমিকভাবে গ্রহণ করেন। বছরের মাঝামাঝি সময়ে কলকাতার মিশন রো এক্সটেনশনের কেন্ট হাউস নামে একটি বাড়িতে আনুষ্ঠানিকভাবে Youth Cultural Institute-এর প্রতিষ্ঠা হয়। সম্পাদক হন জলিমোহন কাউল। যা ১৯৪১-এর গোড়ায় উঠে আসে ৪৬ নং ধর্মতলা স্ট্রিটে।^{৫০} ইয়ুথ কালচারাল ইনস্টিটিউটের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন রেণু রায়, সুনীল চট্টোপাধ্যায়, চিন্মোহন সেহানবীশ, দেবরত বসু, দিলীপ রায়, জ্যোতি বসু, নিখিল চক্রবর্তী প্রমুখ বামপন্থী। ওয়াইসিআই-এর প্রতিষ্ঠা বাংলায় নিজস্ব বামপন্থী সাংস্কৃতিক ফ্রন্টের প্রয়োজনীয়তাকে বাস্তবায়িত করে, যা ক্রমে গণনাট্য সংঘে এসে পূর্ণতা পায়। ধনঞ্জয় দাশ লিখছেন,

"YCI-ই সেদিন আরম্ভ করেছিল নিয়মিত সংস্কৃতি বিষয়ক আলোচনার আসর, বিতর্কসভা, অভিনয়, পোস্টার প্রদর্শনী এবং গান। পরবর্তীকালে গণনাট্য সংঘ বাংলার সংস্কৃতিতে প্রগতিমুখী ভাবধারা সঞ্চালনে যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, সম্ভবত YCI ছিল তার সূতিকাগার"।^{৫১}

YCI মূলত ছিল গান ও নাটক চর্চার কেন্দ্র। দেবব্রত বিশ্বাসের নেতৃত্বে একটি গানের স্কোয়াড ছিল। রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, অতুলপ্রসাদের দেশাত্মবোধক গানগুলিকে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়াই ছিল মূল উদ্দেশ্য। এছাড়া চলত দেশ-বিদেশের বৈপ্লবিক গানের চর্চা। যদিও তাঁদের সর্বাধিক সাফল্য নাটকের ক্ষেত্রে। সুবোধ ঘোষের ফসিল গল্পের নাট্যরূপ 'অঞ্জনগড়' (নাট্যরূপ- সুনীল চট্টোপাধ্যায়) ও সুনীল চট্টোপাধ্যায়ের 'কেরানী' নাটক দুটি ছিল তাঁদের বাংলা নাট্য-প্রযোজনা। এছাড়া জলি কাউলের Politician Take to Rowing', দেবব্রত বসুর 'The Boy Grows Up', 'In The Heart of China', 'The Shopkeepers' নাটকগুলি অনুষ্ঠিত হয়েছিল।^{৫২}

১৯৪১ সালের ২১ জুলাই প্রতিষ্ঠিত হয় 'সোভিয়েত সুহৃদ সমিতি'। কলকাতা অধিবেশনের কৃষক সভার কেন্দ্রীয় কাউন্সিল এ বিষয়ে সর্বপ্রথম প্রস্তাব গ্রহণ করেন। হিটলারের রাশিয়া আক্রমণ এবং বিশ্বজুড়ে ঘনিয়ে আসা ফ্যাসিবাদী বিপদের বিরুদ্ধে সাংস্কৃতিক প্রতিরোধ গড়ে তোলার সংকল্পে 'সোভিয়েত সুহৃদ সমিতি' কাজ করেছিল। অফিস ছিল ৪৬ নং ধর্মতলা স্ট্রিটে। ১৯৪২-এর একটা সময়ে ৪৬ নং ধর্মতলা স্ট্রিটে YCI, 'সোভিয়েত সুহৃদ সমিতি' এবং 'পরিচয়' পত্রিকার অফিস ছিল। ৪৬ নং ধর্মতলা স্ট্রিট তখন হয়ে উঠেছিল বামপন্থী নবজাগরণের প্রাণকেন্দ্র। 'সোভিয়েত সুহৃদ সমিতি'-র প্রাণপুরুষ ছিলেন হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, স্নেহাংশু আচার্য, জ্যোতি বসু, রাধারমণ মিত্র প্রমুখ কমিউনিস্ট সংগঠকরা। সভাপতি হন ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, সম্পাদক হন স্নেহাংশু আচার্য ও হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।^{৫৩}

১৯৪২-এর মাঝামাঝি সময়ে পার্টির নিষেধাজ্ঞা উঠে যাওয়ায় সোভিয়েত-সংস্কৃতির আগমন অনেক সহজ হয়ে গিয়েছিল। যে-কারণে ভাটপাড়া সাংস্কৃতিক সম্মেলন থেকে 'সোভিয়েত সুহদ সমিতি'-র কাজে নতুন জোয়ার আসে। জনসভা, পোস্টার প্রদর্শনী, চলচ্চিত্র, সংগীত-আসর পরিচালিত হয়। ফ্রিডরিখ উলফের (Friedrich Wolf) নাটক অবলম্বনে হারবার্ট রাপাপোর্ট (Herbert Rappaport) নির্দেশিত সিনেমা 'প্রফেসর মামলক' (Professor Mamlock) দেখানো হয়। এই কাহিনি অবলম্বনেই বিনয় ঘোষ 'ল্যাবরেটরি' নাটকটি লেখেন, যা ১৯৪৩-এর মে মাসে মুম্বই-তে গণনাট্য সংঘের প্রথম সম্মেলনে অভিনীত হয়। জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, ট্রামশ্রমিক দশরথলালের লেখা গানে; বিনয় রায়, দেবব্রত বিশ্বাসের বলিষ্ঠ-সুরেলা কণ্ঠের জাদুতে সমিতি আরও জনপ্রিয়তা পায়। তবে এর দুর্বলতা সম্পর্কে সিপিআই-এর তৃতীয় রাজ্য সম্মেলনে ভবানী সেনের 'বঙ্গীয় প্রাদেশিক কমিটির রাজনৈতিক-সাংগঠনিক রিপোর্ট'-এ বলা হয় ''আন্দোলন শুধু উচ্চ শিক্ষিত সমাজের ভিতরই সীমাবদ্ধ থাকছে, গণসংগঠনে পরিণত হচ্ছে না।"^{৫৪}

১৯৪২ সালের ৮ মার্চ ঢাকায় ফ্যাসিস্ট গুণ্ডাদের হাতে খুন হন কমিউনিস্ট আদর্শে বিশ্বাসী তরুণ লেখক সোমেন চন্দ। রাজনৈতিক মতাদর্শ নির্বিশেষে সকল শিল্পী-সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবীরাই এই ঘটনায় বিচলিত হন। এই হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে ২৮ মার্চ ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে রামানন্দ

চট্টোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে আয়োজিত সভায় বাংলার প্রগতিশীল সাহিত্যিকরা একত্রিত হন। এই সভায় যোগ দেন অতুল গুপ্ত, বুদ্ধদেব বসু, অমিয় চক্রবর্তী, আবু সঈদ আইয়ুব, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখরা। এই সভা থেকেই প্রতিষ্ঠিত হয় 'ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ' (Anti Fascist Writers and Artist Association) বা সংক্ষেপে ফ্যাবিলেশিস। সম্পাদক হন বিষ্ণু দে ও সুভাষ মুখোপাধ্যায়। কমিটিতে ছিলেন অতুল গুপ্ত, অমিয় চক্রবর্তী, সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার, হীরণ সান্যাল, বুদ্ধদেব বসু, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়।^{৫৫} 'ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ'-এর মঞ্চ থেকে ঘোষিত হয়,

"দেশ ও সংস্কৃতি রক্ষায় এই আদর্শকে সম্মুখে রাখিয়া 'ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ' গঠিত হইয়াছে। আমরা আমাদের দেশের সমস্ত সাহিত্যিক ও শিল্পীগণকে এই সংঘে যোগদান করিয়া সুনির্দিষ্ট কর্মপন্থার ভিত্তিতে অবিলম্বে কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে আহ্বান জানাইতেছি।"^{৫৬}

আহ্বানে সাড়া দিয়ে রাধারমণ মিত্র, গোপাল হালদার, বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, গোলাম কুদ্দুস, মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়, ননী ভৌমিক, নরহরি কবিরাজ, সুকান্ত ভট্টাচার্য, শওকত ওসমান প্রমুখ কবি-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবীরা যোগ দেন। মণি রায়, জয়নুল আবেদিন, রথীন মৈত্র, শুভো ঠাকুর, চিত্তপ্রসাদ ভট্টাচার্যের মতো শিল্পী মম্বন্তরের যন্ত্রণা, মানুষের রুটি-রুজির লড়াই ও সংগ্রামী মানুষের মিছিলের ডাককে তুলি-কলমে মূর্ত করে তোলেন। সুনীল জানা আর শম্ভু সাহার ক্যামেরার লেঙ্গ সেদিনের ইতিহাসকে ভবিষ্যতের জন্য তুলে রাখে। সংগীতের ফ্রন্টে যুক্ত হন শচীন দেববর্মন, নির্মল চৌধুরী, নিবারণ পণ্ডিত প্রমুখ। পেশাদার থিয়েটার থেকে এসে যোগ দিলেন মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য। সুধী প্রধান, চিন্মোহন সেহানবীশের পাশাপাশি সোমনাথ লাহিড়ী, ভবানী সেনের মতো কমিউনিস্ট সংগঠকদেরও অন্তর্ভুক্তি ঘটল। কমিউনিস্ট পার্টির সর্বতারতীয় সম্পাদক পি সি যোশীর প্রত্যক্ষ প্রেরণা ও উৎসাহ প্রথম থেকেই ছিল। সব মিলিয়ে 'ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ'-এর ৪৬ নং ধর্মতলা স্ট্রিটের অফিস হয়ে উঠল প্রবীণ-নবীন সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক

এঁদের প্রথম সম্মেলন ১৯৪২-এর ১৯-২০ ডিসেম্বর ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে, দ্বিতীয় সম্মেলন ১৯৪৪-এর ১৫-১৭ জানুয়ারি ভারতসভা হলে এবং তৃতীয় সম্মেলন ১৯৪৫-এর ২-৮ মার্চ মহম্মদ আলি পার্কে অনুষ্ঠিত হয়।^{৫৮} প্রথম সম্মেলনের চেয়ারম্যান হন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষ থেকে সাংস্কৃতিক আন্দোলনকে পরিচালনা ও বৃহত্তর করে তোলার জন্য কয়েকটি 'সেল' গঠন করা হয়। যেমন গণনাট্য সেল, লেখক ও সাংবাদিক সেল, চিত্রশিল্পী সেল, 'পরিচয়' সেল প্রভৃতি।^{৫৯} দ্বিতীয় সম্মেলনের সভাপতিত্ব করেন সাহিত্যিক প্রেমেন্দ্র মিত্র। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে 'ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ'-এর দ্বিতীয় সম্মেলনের সাত মাস আগেই মুম্বই-এ ১৯৪৩-র ২৫ মে 'ভারতীয় গণনাট্য সংঘ' প্রতিষ্ঠা হয়ে গিয়েছিল। 'ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ'-এর শাখা রূপে গণনাট্য সংঘ মন্বন্তর ও জাপানি আক্রমণের আশঙ্কার দিনগুলিতে মানুষকে বাঁচার নতুন স্বপ্ন দেখিয়েছিল। এই সম্মেলনে নিবারণ পণ্ডিতের গান, পানু পালের (পূর্ণেন্দু কুমার পালচৌধুরী) 'মহামারি নৃত্য', বিনয় রায়ের 'ম্যা ভুখা হুঁ' খুবই সাড়া ফেলেছিল। তৃতীয় সম্মেলনের সভাপতি ছিলেন শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়। চিত্রকলা প্রদর্শনী, কবিগানের লড়াই, লোকসংগীত, গণসংগীত, নাটক সব মিলিয়ে এই সম্মেলন খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল। বিশেষত কোচবিহারের অন্ধ গায়ক টগর অধিকারীর 'দোতারা' সহযোগে গান, গণনাট্য সংঘের সেন্ট্রাল স্কোয়াডের 'ভারতের মর্মবাণী', বিজন ভট্টাচার্যের 'নবান্ন' নাটক ছিল মুখ্য আকর্ষণ।

'ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ'-এর পক্ষ থেকে ১৯৪২-র ১৬ মে 'জনযুদ্ধ' পত্রিকায় নাটকের জন্য বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়। 'বনস্পতি গুপ্ত' ছদ্মনামে সিপিআই নেতা সোমনাথ লাহিড়ীর লেখা 'দেশরক্ষার ডাক' নাটকটি শ্রেষ্ঠ বিবেচিত হয়।^{৬০} জুলাই মাসে 'ফ্যাবিলেশিস'-এর পক্ষ থেকে বারোটি ফ্যাসিবিরোধী গানের সংকলন 'জনযুদ্ধের গান' প্রকাশিত হয়। সংকলনটিতে মোহিত ব্যানার্জি অনূদিত 'সোভিয়েত জাতীয় সংগীত', 'কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক' ছাড়াও সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের লেখা 'বজ্রকণ্ঠে তোলো আওয়াজ' এবং বিনয় রায়ের 'চাষি গেরিলার গান' দুটি সংকলিত হয়। এছাড়া এই সময়ে কনক মুখার্জির 'দেশরক্ষার ডাক', হেমাঙ্গ বিশ্বাসের 'বিষাণ' প্রভৃতি গানের সংকলন এবং ময়মনসিংহের কবি নিবারণ পণ্ডিতের 'জনযুদ্ধের ডাক' সংকলনটি প্রকাশিত হয়।^{৬১}

'গণনাট্য সংঘ'-এর প্রতিষ্ঠা :

১৯৪৩ সালের ২৫ মে মুম্বইতে প্রগতি লেখক সংঘের চতুর্থ সর্বভারতীয় সম্মেলনে ভারতীয় গণনাট্য সংঘ বা IPTA-এর প্রথম সর্বভারতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। অবশ্য 'গণনাট্য' ও 'জননাট্য' শব্দটির প্রয়োগ তার আগে থেকেই ছিল। শুধু রাজনৈতিক চেতনা নয়, সংঘের কাহিনি নির্বাচন-আঙ্গিক-অভিনয় ভঙ্গিতে বিশ্বের নানা সাংস্কৃতিক আন্দোলনের প্রভাব ছিল। ১৯০২ সালে রম্যাঁ রলাঁর 'ল্য থিয়েটার দু পুপল' গ্রন্থে নাট্যচর্চার পদ্ধতি, রাশিয়ার অ্যাজিট-প্রপ থিয়েটার, চিনের বিপ্লবী রেড থিয়েটারের প্রত্যক্ষ অনুপ্রেরণা সঙ্গী করে গণনাট্যের পথ চলা শুরু হয়। আমরা গণনাট্য সংঘের নাটকের তাত্ত্বিক প্রয়োগে এ বিষয়ে আরও বিস্তারিত আলোচনার অবতারণা করব।

গণনাট্য সংঘের প্রথম সর্বভারতীয় সম্পাদক হন অনিল ডি'সিলভা। বাংলায় 'ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ'-এর নাট্যশাখা তার আগে থেকেই সক্রিয় ছিল। যার সম্পাদক ছিলেন সুনীল চট্টোপাধ্যায়। গণনাট্যের সর্বভারতীয় সম্মেলনের দু-মাসের মাথায় 'ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ'-এর নাট্যবিভাগেই রদবদল করে গণনাট্য সংঘের কমিটি তৈরি করা হয়। সম্পাদক হন সুধী প্রধান।^{৬২} প্রাথমিকভাবে বাংলায় গণনাট্য সংঘের কাজ ছিল সাংস্কৃতিক স্কোয়াড রূপে ফ্যাবিলেশিসের অধীনে দুর্ভিক্ষপীড়িত বাংলার জন্য সাহায্য সংগ্রহ করা। গণনাট্যের সর্বভারতীয় সংগঠন গঠিত হওয়ার আগেই মে মাসে কলকাতার নাট্যভারতী মঞ্চে বিজন ভট্টাচার্যের 'আগুন' এবং বিনয় ঘোষের 'ল্যাবরেটরি' নাটক দুটি অভিনীত হয়। 'ল্যাবরেটরি' নাটকটি গণনাট্যের সর্বভারতীয় সম্মেলনেও মঞ্চস্থ হয়। ১৯৪৪-এর শুরুতে মঞ্চস্থ হয় মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের 'হোমিওপ্যাথি' এবং বিজন ভট্টাচার্যের 'জবানবন্দী' নাটক দুটি। বছরের শেষ দিকে ২৪ অক্টোবর শ্রীরঙ্গম মঞ্চে অভিনীত হয় 'নবান্ন' নাটক। 'নবান্ন' অভিনয় শুধু গণনাট্য আন্দোলনের ক্ষেত্রে নয়, বাংলা নাটকের ক্ষেত্রেও এক বিরাট পালাবদলের সাক্ষী। গত কয়েক বছর ধরে বাঙালির অন্তরাত্মার উপর দিয়ে যে ঝড় বয়ে গেছে 'নবান্ন' নাট্যাভিনয় ছিল তার আলেখ্য। আর পরবর্তী কয়েক যুগ ধরে বাংলা নাটক ও নাট্যমঞ্চ যে নিরন্তর পরীক্ষা-নিরীক্ষায় জাতির দর্পণ হয়ে উঠবে 'নবান্ন' ছিল তার পথিকৃৎ। দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষের না বলা বাণীর বক্তা হয়ে উঠেছিল 'নবান্ন'; হয়ে উঠেছিল গণজীবনের প্রতিচ্ছবি। 'জনগণের দ্বারা'

না হলেও 'জনগণের জন্য' শিল্পরূপের আদর্শ হয়ে উঠেছিল 'নবান্ন' নাট্যাভিনয়। অবশ্য সমকালীন সমালোচক 'নবান্ন' সম্পর্কে মন্তব্য করেছিলেন, ''নাটক হিসাবে 'নবান্ন'কে মোটেই সক্ষম রচনা বলা চলে না।"^{৬৩} কিন্তু 'নবান্ন'-তে কী নেই, তার চেয়েও বড়ো হয়ে উঠেছিল তাতে কী আছে! যে কারণে মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য বলেছিলেন, ''জবানবন্দী', 'নবান্ন' এদের নাটকত্বের বিচার অন্য নাটকের সূত্রে চলবে না। এরা এক নতুন সৃষ্টি। এদের কানুন তৈরি করতে হবে পরে।"^{৬৪}

বাংলার নাট্য-ঐতিহ্য এবং গণনাট্য সংঘ :

'জবানবন্দী', 'নবান্ন'-এর মতো নাটক অভিনয় ছাড়াও গণনাট্য সংঘের সাফল্যের ক্ষেত্রে পরোক্ষ ভূমিকা ছিল তৎকালীন বাংলা পেশাদার থিয়েটারের। আসলে পেশাদার থিয়েটার একটা বিরাট সংখ্যক জনমানসের কাছে আদৃত হলেও সমকালে পরিবর্তিত যুগের আহ্বানে সাড়া দিতে পারেনি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর বাংলায় সামাজিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক পালাবদলের ঢেউ এবং তার সঙ্গে জড়িত মানসিক দ্বন্দ্বের ইতিহাস যেভাবে কবিতা-উপন্যাসে উঠে এসেছিল, পেশাদার নাট্যমঞ্চ তার থেকে শত যোজন দূরে ছিল। বিংশ শতকের দুই-তিনের দশকের নাট্যমঞ্চ বৃহত্তর মানুযের জীবন-যন্ত্রণার ব্যাপ্তির সঙ্গে তাল মেলাতে পারেনি। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পেশাদার থিয়েটার সময়ের প্রশ্বগুলিকে অনুধাবন করতে পারেনি।

বাংলা পেশাদার থিয়েটারের যাত্রাপথ শুরু হয় ১৮৭২ সালের ৭ ডিসেম্বর। উত্তর কলকাতার কয়েকজন নাট্যপাগল যুবক নাট্যকলাকে ধনী বাঙালির বাঁধা মঞ্চ থেকে মুক্তি দিয়ে জনতার সম্মুথে নিয়ে আসে। নিদ্রোত্থিত জাতির প্রতীক স্বরূপ তাঁরা প্রতিষ্ঠা করেন 'ন্যাশনাল থিয়েটার'। প্রথম মঞ্চস্থ নাটকটির নাম 'নীলদর্পণ', রচয়িতা দীনবন্ধু মিত্র। তাঁরা সেদিন এমন একটি নাটক বেছে নিয়েছিলেন যা বাংলার নিপীড়িত নীলচাম্বির মর্মকথা ও তাদের বিদ্রোহের সাক্ষী। মধুসূদন দত্ত কৃত ইংরেজি অনুবাদ জেমস লঙ-এর প্রকাশনায় 'নীলদর্পণ' নাটকের ঝড় ব্রিটিশ পার্লামেন্টে পোঁছে যায়। অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে, "এ-দেশে-বিদেশে নীলকর সাহেবদের বিরুদ্ধে খুব আন্দোলন

হল—ইন্ডিগো কমিশন বসল, আইন করে উক্ত শ্বেতাঙ্গ বর্বরদের ক্ষমতা সংকুচিত হল, কিন্তু এ সবের মূলে হচ্ছে দীনবন্ধুর 'নীলদর্পণ' নাটক।"^{৬৫} উল্লেখ্য যে, 'নীলদর্পণ' নাটকের অভিনয় পরাধীন ভারতে ও জাতীয় কংগ্রেস শাসিত স্বাধীন ভারতেও নিষিদ্ধ করা হয়। ফলে বাংলা থিয়েটারের সূচনালগ্ন হয়ে উঠেছিল এক যুগান্তকারী ঘটনা। প্রথমত সে নাট্যসরস্বতীকে নিয়ে এসেছিল জনতার দরবারে আর দ্বিতীয়ত তাতে ছিল বিপ্লবী ঐতিহ্যের সহমর্মী হয়ে ওঠার দায়।

এরপর মীর মোশাররাফ হোসেনের 'জমিদার দর্পণ', দক্ষিণাচরণ চট্টোপাধ্যায়ের 'চা-কর দর্পণ' প্রভৃতি নাটকে ব্রিটিশদের অত্যাচারকে নাট্যরূপ দেওয়ার ধারাবাহিক প্রচেষ্টা দেখা যায়। মধুসূদন দত্তের 'একেই কি বলে সভ্যতা' ও 'বুড় শালিখের ঘাড়ে রোঁ'-তে আমরা যথাক্রমে শহুরে উচ্ছুঙ্খল নব্যবঙ্গ যুবকদের ও ক্ষয়িষ্ণু সামন্ততন্ত্রকে ব্যঙ্গের কষাঘাতে জীর্ণ হতে দেখি। সমসময়ে বাংলায় যে জাতীয়তাবাদী চেতনার বিকাশ ঘটতে থাকে, তারই প্রভাব দেখি কিরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ভারতে যবন', জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'পুরুবিক্রম', নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'গুইকোয়ার', অমৃতলালের 'হীরকচূর্ণ' প্রভৃতি নাটকে। এগুলিতে কখনও অতীতের ঘটনা ছায়ায় বা কখনও প্রকাশ্যে ইংরেজ বিরোধিতার স্বর শোনা যাচ্ছিল। যা উপেন্দ্রনাথ দাসের 'শরৎসরোজিনী' ও 'সুরেন্দ্রবিনোদিনী' নাটকে চরমে ওঠে।

১৮৭৬ সালের ১৬ ডিসেম্বর ব্রিটিশ সরকার 'Dramatic Performances control Bill' বা নাট্যাভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইন জারি করে। গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে উপেন্দ্রনাথ দাস রানি ভিক্টোরিয়ার পুত্র প্রিন্স অফ ওয়েলসের কলকাতা আগমন ও পরবর্তী কর্মকাণ্ডকে ব্যঙ্গ করে নাটক লেখেন 'গজদানন্দ ও যুবরাজ'। এরপর তিনি তৎকালীন পুলিশ সুপার মিঃ ল্যাম্ব ও পুলিশ কমিশনার মিঃ হগকে ব্যঙ্গ করে নাটক লিখলেন 'The Police of Pig and Sheep'। জাতীয়তাবোধ ও দেশপ্রেমকে রোধ করার জন্য ইংরেজ সরকার আইনটি আনতে বাধ্য হয়। এ দেশেরই কিছু নীতিবাগীশ মানুষের সংস্কারী চিন্তা যাকে সমর্থন করে। আন্চর্যজনকভাবে স্বাধীন ভারতেও দীর্ঘদিন এই আইন জারি ছিল, এমনকি একটা সময়ে এই আইন আরও জোরদার করার চেষ্টা করা হয়।

স্বাভাবিকভাবেই এই আইনের পরে বাংলা নাটকের অভিমুখ বদলে যায়। গিরিশচন্দ্র ঘোষ তাঁর ধর্মাশ্রিত নাটক আশ্রয় করে নাটমঞ্চে ভক্তির জোয়ার আনলেন। অমৃতলাল বসু, অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফি, অমরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রমুখদের নাট্যরচনা ও নাট্যপ্রযোজনাও একই খাতে বয়ে যেতে থাকে। দর্শকের আনুকুল্যে পেশাদার থিয়েটার হয়ে ওঠে অর্থ উপার্জনের যন্ত্র বিশেষ। স্টার থিয়েটার, মিনার্ভা থিয়েটার, ক্লাসিক থিয়েটার প্রভৃতি রঙ্গমঞ্চে জনপ্রিয়তার প্রতিযোগিতা শুরু হয়। জনপ্রিয় বিষয়ের পুনরাবৃত্তি, প্রযোজনায় গিমিকের অতিরেক, অভিনেত্রীদের পণ্য করে তোলার মাধ্যমে বাংলা নাটক 'নীলদর্পণ'-এর বৈপ্লবিক ঐতিহ্যকে অস্বীকার করেছিল। বিংশ শতাব্দীর দুই-তিনের দশকে গিরিশচন্দ্র ঘোষ (১৮৪৪-১৯১২), অমৃতলাল বসু (১৮৫৩-১৯২৯), অমরেন্দ্রনাথ দত্তর (১৮৭৬-১৯১৬) মৃত্যুর পর বাংলা নাটমঞ্চে কিছু পরিবর্তন আসে। একক মালিকানার বদলে প্রতিষ্ঠিত হয় লিমিটেড কোম্পানি। অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শিশিরকুমার ভাদুড়ী, অহীন্দ্র চৌধুরী, দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখরা থিয়েটারের প্রধানতম মুখ হয়ে ওঠেন। শিশিরকুমার ভাদুড়ীর হাতে নাট্যনির্দেশনা অন্য মাত্রা পায়। পেশাদার থিয়েটারে কাঠামোগত কিছু পরিবর্তন আসে। আগে যেরকম গিরিশ ঘোষ বা অমরেন্দ্রনাথ দত্তরা নট-নাট্যকার-নির্দেশক সমস্ত ভূমিকা একাই পালন করতেন, তার থেকে খানিকটা আলাদা হয়ে ক্ষিরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ, যোগেশ চৌধুরী, মন্মথ রায়, শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত মতো শক্তিশালী নাটককাররা পেশাদার মঞ্চের সঙ্গে চুক্তিভিত্তিকভাবে যুক্ত হন।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর পরিস্থিতি ও ভারতের স্বাধীনতার দাবি জোরদার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রাজনৈতিক নাটকের প্রযোজনা বৃদ্ধি পায়। কিন্তু আইনকে ফাঁকি দেওয়ার জন্য তাকে ঐতিহাসিক বা পৌরাণিক ঘটনার ছদ্মবেশ ধারণ করতে হয়েছিল। মন্মথ রায়ের 'দেবাসুর' (১৯২৩) নাটকে দেব ও অসুরের লড়াই ব্রিটিশ বনাম ভারতীয়দের স্বাধীনতা যুদ্ধের লড়াইয়ের রূপ নেয়। 'কারাগার' নাটকে কৃষ্ণ্ণের জন্মবৃত্তান্তের পৌরাণিক কাহিনি প্রেক্ষাপটে রেখে গান্ধীজির অহিংস ভাবাদর্শকে প্রকাশ করা হয়েছে। শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের 'গৈরিক পতাকা' (১৯৩০) নাটকে ত্যাগের মাহাত্মকে সামনে রেখে ছত্রপতি শিবাজীর মতো এক ঐতিহাসিক বীরের সন্ধান করা হয়েছে। যিনি দেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে সঠিক দিশা দেখাবেন। 'সিরাজদৌল্লা' নাটকে একই দাবিতে শুধু নায়ক চরিত্র বদলে যায়। 'দশের

দাবি' (১৯৩৫) নাটকে গান্ধীজির হরিজন সেবার আদর্শ এবং 'সংগ্রাম ও শান্তি' নাটকে ভগ্ন সামন্ততন্ত্রের প্রতি নাটককারের সহমর্মিতা উঠে আসে। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাটকে ক্ষয়িষ্ণু সামন্ততন্ত্র, নব্য পুঁজিবাদ ও সম্ভাব্য সমাজতন্ত্রের ভিন্ন সমাজব্যবস্থার দ্বন্দ্ব দেখা যায়। হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতির বাণী, পরাধীনতার জ্বালা, জাতীয়তাবাদের একনিষ্ঠ প্রকাশ ছিল এই সময়ের রাজনৈতিক নাটকের মূল বৈশিষ্ট্য।

সামাজিক নাটকের কাহিনি বিন্যাস ও চরিত্র চিত্রণ ক্ষেত্রেও দেখা যায় জীবনের দ্বিধা-দ্বন্দ্বের প্রকাশ। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকেই দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'পরপারে' বা 'বঙ্গনারী'-র মতো নাটকের নারী চরিত্রে ইবসেনের 'আ ডলস হাউস' নাটকের নোরা চরিত্রের প্রভাব দেখা যায়। তিনের দশকে মন্মথ রায় তাঁর 'কারাগার' নাটকের কংস চরিত্রে ও 'অর্শোক' নাটকের নাম চরিত্রে মানব মনের জটিল আঁধারের অম্বেষণে ব্যাপ্ত হন। শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের 'ঝড়ের রাতে' নাটকে নারীর যৌনজিজ্ঞাসা ও ব্যক্তিত্ব-প্রতিষ্ঠার মধ্যে ফ্রয়েডীয় মনোবিকলনতত্ত্বের আঁচ পাওয়া যায়। বিধায়ক ভট্টাচার্যের নাটকে মধ্যবিত্ত জীবনের নানা জটিল সমস্যা ঘুরে-ফিরে আসে। 'মাটির ঘর', 'রক্তের ডাক' নাটকের উপজীব্য ব্যক্তিত্বময়ী নারীর প্রণয় জীবনের জটিলতা। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাসের স্বকৃত নাট্যরূপগুলিও সেই সময়ে জনপ্রিয় হয়।

সমকালের বিচারে নাটকগুলি যুগোপযুগী হলেও তা পর্যাপ্ত ছিল না। রাজনৈতিক নাটকগুলি অনেকক্ষেত্রেই যুগের দাবির সঙ্গে তাল মেলাবার জন্যও মঞ্চস্থ হত। স্বাধীনতার বাণীকে প্রকাশের জন্য রাজনৈতিক ছদ্মবেশ নিতে নাটককাররা বাধ্য থাকতেন ঠিকই, কিন্তু তাতে বলিষ্ঠ কোনো অভিমুখ থাকত না। তাতে জনপ্রিয় হওয়ার উপাদান থাকত, মধ্যবিত্ত দর্শকের আত্মপ্লাঘা প্রকাশের স্থান থাকত কিন্তু বৃহত্তর জনতার কাক্ষিত জয়ের আত্মবিশ্বাস থাকত না। সামাজিক নাটকের বিষয়বস্তুর মধ্যে নিয়তিবাদ, নারী-স্বাধীনতার অভাব ও পশ্চাদমুখীনতার ছোঁয়াচ এড়িয়ে প্রগতিমুখীন হওয়ার চেষ্টা এই সময়ে দেখা যায়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে ফ্রয়েডীয় মনোবিকলন তত্ত্বের প্রভাবও দেখা যায়। কিন্তু তা কোনোতাবেই কল্লোলের সাহিত্যের মতো উদ্দাম ও নিরাবরণ ছিল না। তার কারণ পেশাদার নাট্যমঞ্চকে তাকিয়ে থাকতে হত জনসাধারণের গ্রহণযোগ্যতার দিকে। আবার বিশ্বযুদ্ধের অভিঘাতে

সমাজ জীবনে যে বিরাট পরিবর্তন দেখা দেয় পেশাদার নাট্যমঞ্চ শুধু তাকেই চিহ্নিত করেছে। সে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে মৌলিক কিছু অনুসন্ধান করেনি, কিংবা নতুন কোনো মূল্যবোধের সন্ধানও দেয়নি।

আমরা সচেতনভাবেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাট্যচর্চাকে এই আলোচনার মধ্যে গ্রহণ করছি না। কারণ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাট্যচর্চা তখনও বাংলা নাট্যধারার মূলস্রোত হয়ে ওঠেনি। পেশাদার থিয়েটারও রবীন্দ্রনাথের প্রহসন ছাড়া অন্যান্য নাটককে সানন্দে গ্রহণ করেনি। শিশিরকুমারের নির্দেশনায় 'শেষরক্ষা' ও 'তপতী' নাট্যাভিনয় বাংলা থিয়েটারের ইতিহাসে পরীক্ষামূলক ব্যর্থতার ইতিহাস রূপেই রয়ে গেছে। এছাড়াও ধর্মাপ্রিত নাটক, জীবনবিমুখ লঘু প্রহসন বা কাল্পনিক রাজৈশ্বর্যের নাটকের যে গতানুগতিক স্রোত আগে থেকেই চলছিল, সেটাও ছিল জনগণের মূল আকর্ষণের বিষয়। চারের দশকের উত্তাল সময়েও তার কোনো পরিবর্তন চোখে পড়ে না। ১৯৪২-৪৩ সালে স্টার থিয়েটারে অভিনীত হয়েছিল 'রাণী ভবানী', 'পুরীর মন্দির', 'মহারাজা নন্দকুমার', 'কৃষ্ণার্জুন' ইত্যাদি নাটক। মিনার্ভা, রঙমহল, শ্রীরঙ্গম সর্বত্রই একই ধরণের নাটকের অভিনয় চলছিল।

অন্যদিকে প্রগতি লেখক সংঘ, ফ্যাবিলেশিস, YCI, সোভিয়েত সুহৃদ সমিতির সংস্কৃতি চর্চা সময়ের তীব্রতাকে প্রকাশ করতে বদ্ধপরিকর ছিল। পেশাদার থিয়েটারের বাইরে স্বাধীন নাট্য প্রচেষ্টাতেও ভাবগত পরিবর্তন আসতে থাকে। ১৯৩৬ সালের মে মাসে জ্যোর্তিময় সেনগুপ্ত শ্রমিক-মালিক সংঘর্ষ নিয়ে 'ভাঙা চাকা' নামে একটি নাটক লিখেছিলেন। যে নাটকটিকে রামপ্রসাদ দে বলেছিলেন "এই যুগের প্রথম গণনাট্য।"^{৬৬} যেখানে ব্যক্তি একক রূপে নয়, উঠে আসে তার শ্রেণিচেতনা। জ্যোর্তিময় সেনগুপ্তের আরেকটি নাটক 'চালের দর'-এ কৃষক চরিত্রটি সহানুভূতির অপেক্ষা না করে দলবদ্ধ হয়ে নিজ-শ্রেণির স্বার্থরক্ষায় তৎপর হয়ে ওঠে। ১৯৩৮ সালে দয়ালকুমার 'মুক্তির অভিযান' ও 'আলোর পথে' নামের দুটি ফ্যাসিবিরোধী নাটক লেখেন।

YCI-এর প্রযোজনায় ১৯৪০ সালে সুবোধ ঘোষের 'ফসিল' গল্পের সুনীল চট্টোপাধ্যায় কৃত নাট্যরূপ 'অঞ্জনগড়' ও তাঁর নিজের লেখা 'কেরানী' নাটকদুটি মঞ্চস্থ হয়। 'অঞ্জনগড়' নাটকে দেশীয়

8¢

সামন্ত রাজার অত্যাচার এবং ব্রিটিশ প্রভুর চিরন্তন বেনিয়া বৃত্তির নগ্ন শোষণের কাহিনি বলা হয়েছে। শ্রমিক-কৃষকের জীবনের কোনো মূল্যই এদের হাতে গড়া সমাজে থাকতে পারে না। শোষিত মানুষের মৃতদেহ একদিন ফসিল হয়ে নৃতত্ত্ব গবেষণার বিষয়বস্তু হয়ে ওঠে। 'কেরানী' নাটকে শ্রমিকরা একজোট হয়ে ধর্মঘট করে তাঁদের প্রাপ্য আদায় করে নেয়। কিন্তু কেরানিরা তাঁদের মধ্যবিত্ত মানসিকতার ক্ষুদ্র স্বার্থে ও বিচ্ছিন্নতার দৈন্যে শ্রেণিচ্যুত হয়ে একত্রিত হতে পারে না। ফলে আজীবন তাঁদের অপমানিত-লাঞ্ছিত হতে হয়। YCI কয়েকটি ইংরেজি নাটকও মঞ্চস্থ করে। সেগুলি হল জলি কাউলের 'Politician Take to Rowing', দেবরত বসুর 'The Boy Grows Up', 'In The Heart of China', 'The Shopkeepers' ' 'Politician Take to Rowing' নাটকে চার্চিল, হিটলার, লিনলিথগো, চেম্বারলেন প্রভৃতি রাজনৈতিকদের ভণ্ডামি উন্মোচিত হয়েছে। 'The Boy Grows Up' নাটকে সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতা করা হয়েছে। 'In The Heart of China'-তে চিনের লাল-ফৌজের বীরত্বগাথা বর্ণিত। 'The Shopkeepers'-এ হিটলারের ফ্যাসিজমের মর্মান্তিক চিত্র বর্ণিত। নাটকগুলিতে রাজনৈতিক চেতনা থাকলেও তা ইংরেজিতে অভিনীত হওয়ায় গণনাট্যের অধিকারী হতে পারেনি। যে কারণে সেই সময়েই ছাত্র ফেডারেশনের পক্ষ থেকে তাঁদের গঞ্জনা শুনতে হয়েছিল। "YCI-এর সাংস্কৃতিক কার্যকলাপ সমাজের উচ্চকোটির মানুষের সন্তানদের বিলাসী খেয়াল পরিতৃপ্তির মধ্যেই সীমাবদ্ধ এবং পার্টির পক্ষে এটা 'শ্বেতহস্তী পোষার সামিল'।"^{৬৭}

১৯৪২ সালে সিপিআই নেতা সোমনাথ লাহিড়ী 'বনস্পতি গুপ্ত' ছদ্মনামে 'দেশরক্ষার ডাক' নাটকটি লেখেন। এরপর ফ্যাবিলেশিসের প্রযোজনায় বিনয় ঘোষের 'ল্যাবরেটরি' ও বিজন ভট্টাচার্যের 'আগুন' এবং 'গণনাট্য সংঘ'-এর প্রযোজনায় 'জবানবন্দী' ও 'নবান্ন' প্রযোজিত হয়। পেশাদার থিয়েটারের সবচেয়ে বড়ো দুর্বলতা ছিল যে মানুষকে সমাজ পরিবর্তনের আত্মবিশ্বাস দিতে পারেনি। মানুষও তাই তার থেকে সস্তা বিনোদনের বাইরে কিছু প্রত্যাশা করেনি। গণনাট্য সংঘ সেই দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন করে নাটককে সমাজ বদলের হাতিয়ার করে তুলতে চেয়েছিল। পরবর্তী অধ্যায়ে গণনাট্য সংঘের সেই ইতিহাসকে আমরা পর্যবেক্ষণ করব।

তথ্যসূত্র :

- ১ · Sudhi Pradhan (Editor); Marxist Cultural Movement in India (MCMI), Vol. 1, National Book Agency, Calcutta, 1985, প্- ১৫৯
- ২। সুধী প্রধান; গণনাট্য আন্দোলনের কয়েকটি অতীত প্রসঙ্গ, গণনাট্য ৩ বর্ষ, জুলাই ও অক্টোবর ৬৭, পৃ- ১৭
- ৩। সুকোমল সেন; ভারতের শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাস, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১৫, পৃ- ১৩০
- 8 T. S. Eliot; The Hollow Men; Poems 1909-1925, Faber & Faber Limited, London, p- 123
- ৫। জীবেন্দ্র সিংহ রায়; কল্লোলের কাল, দে'জ পাবলিশিং, ১৯৬০, পৃ- ১১৯
- ৬। দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়; অভিনব একাঙ্ক, ১৯৬২, ভূমিকা, পৃ- ৬
- ৭। অনিল বিশ্বাস (সম্পাদনা); বাংলার কমিউনিস্ট আন্দোলন : দলিল ও প্রাসঙ্গিক তথ্য, প্রথম খণ্ড, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, ২০০৯, পৃ- ১৩
- ৮। প্রাগুক্ত, ভারতের শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাস, পৃ- ১৬৮
- ৯। প্রাগুক্ত, বাংলার কমিউনিস্ট আন্দোলন : দলিল ও প্রাসঙ্গিক তথ্য, প্রথম খণ্ড, পৃ- ১৪

১০। তদেব, পৃ- ১৪

১১। তদেব, পৃ- ১৬

১২। ভানুদেব দত্ত; অবিভক্ত কমিউনিস্ট আন্দোলনে বাংলা প্রেক্ষাপট : ভারত, মনীষা, ২০১৫, পৃ-১৬

১৩। তদেব, পৃ- ১৬

281

http://www.marxists.org/reference/archive/dimitrov/works/1935/08_02.htm

- ১৫। ধনঞ্জয় দাশ (সম্পাদনা); মার্কসবাদী সাহিত্য বিতর্ক, নতুন পরিবেশ প্রকাশনী, ১৯৬০, ভূমিকা, পৃ- দশ
- ১৬। দীপক মিত্র; ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনের তথ্য সংকলন, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১৬, পৃ- ৫১
- ১৭। বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়; দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, নবপত্র প্রকাশন, ১৯৬০, পৃ-৭৮
- של Pablo Neruda; Ode to Federico Garcia Lorca; Residence on Earth; Translated by Donald D. Walsh, A New Directions Book
- ১৯। নেপাল মজুমদার; প্রগতি লেখক আন্দোলনের সূচনাপর্ব, মার্কসবাদী সাহিত্য বিতর্ক ৩, ধনঞ্জয় দাশ (সম্পাদনা), নতুন পরিবেশ প্রকাশনী, ১৯৫৮, পৃ- ৪৫৭
- ২০। শক্তিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়; প্রসঙ্গ গণনাট্য, গণমন প্রকাশন, ২০০০, পৃ- ১৪৪
- ২১। প্রাণ্ডক্ত, মার্কসবাদী সাহিত্য বিতর্ক ৩, পৃ- ৪৫৯
- ২২। প্রাগুক্ত, মার্কসবাদী সাহিত্য বিতর্ক, পৃ- দশ
- ২৩। প্রাগুক্ত, মার্কসবাদী সাহিত্য বিতর্ক ৩, পৃ- ৪৫৯
- ২৪। চিন্মোহন সেহানবীশ; ৪৬ নং—একটি সাংস্কৃতিক আন্দোলন প্রসঙ্গে, সেরিবান, কলকাতা, ২০১৫,

পৃ- ৫৭

২৫। প্রাগুক্ত, প্রসঙ্গ গণনাট্য, পৃ- ১৪৪

২৬। সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী ও হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (সম্পাদনা), প্রগতি, প্রগতি লেখক সঙ্ঘ, ১৩৪৪,

পৃ- ২০৩

২৭। প্রাগুক্ত, মার্কসবাদী সাহিত্য বিতর্ক, পৃ- আট

২৮। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর; রাশিয়ার চিঠি, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, জ্যৈষ্ঠ ১৩৫২, পৃ- ৩৫

২৯। প্রাগুক্ত, মার্কসবাদী সাহিত্য বিতর্ক, পৃ- তেইশ

৩০। তদেব, পৃ- চৌদ্দ

8b

৩১। প্রাগুক্ত, প্রগতি, পৃ- উৎসর্গপত্র

৩২। তদেব, পৃ- ৭৩, ৭৬

৩৩। প্রাগুক্ত, মার্কসবাদী সাহিত্য বিতর্ক, পূ- চব্বিশ

- ৩৪। বিপান চন্দ্র, অমলেশ ত্রিপাঠী, বরুণ দে; স্বাধীনতা সংগ্রাম (অনুবাদ- ব্রজদুলাল চট্টোপাধ্যায়), ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, দিল্লি, ২০০০, পৃ- ১৮০
- ৩৫। প্রাণ্ডক্ত, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ- ১২৫
- ৩৬। প্রাগুক্ত, স্বাধীনতা সংগ্রাম, পৃ- ১৮১
- ৩৭। সুমিত সরকার; আধুনিক ভারত ১৮৮৫-১৯৪৭, কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানি, কলকাতা,

২০১৩, পৃ- ৩২৩

- ৩৮। বদরুদ্দিন উমর; ভারতের জাতীয় আন্দোলন, চিরায়ত প্রকাশন, ১৯৯০, পৃ- ১১৩
- ৩৯। প্রাগুক্ত, আধুনিক ভারত ১৮৮৫-১৯৪৭, পৃ- ৩৩২
- ৪০। প্রাগুক্ত, স্বাধীনতা সংগ্রাম, পৃ- ১৮৫
- ৪১। প্রাগুক্ত, আধুনিক ভারত ১৮৮৫-১৯৪৭, পৃ- ৩৪৬
- ৪২। তদেব, পৃ- ৩৪১
- ৪৩। প্রাগুক্ত, ভারতের জাতীয় আন্দোলন, পৃ- ১১৬
- 88। প্রাগুক্ত, বাংলার কমিউনিস্ট আন্দোলন : দলিল ও প্রাসঙ্গিক তথ্য, প্রথম খণ্ড, পু- ৭৫

৪৫। তদেব, পৃ- ৬৫

৪৬। মণিকুন্তলা সেন; সেদিনের কথা, নবপত্র প্রকাশন, ১৩৫৯ বঙ্গাব্দ, পৃ- ৬১

৪৭। প্রাগুক্ত, বাংলার কমিউনিস্ট আন্দোলন : দলিল ও প্রাসঙ্গিক তথ্য, প্রথম খণ্ড, পৃ- ১০৫

৪৮। তদেব, পৃ- ৩০৭

৪৯। অমলেন্দু সেনগুপ্ত; উত্তাল চল্লিশ অসমাপ্ত বিপ্লব, প্রতিভাস, ২০০৬, পৃ- ২৭

৫০। প্রাগুক্ত, প্রসঙ্গ গণনাট্য, পৃ- ১৪৬

৫১। প্রাগুক্ত, মার্কসবাদী সাহিত্য বিতর্ক, পৃ- সাতাশ

৫২। অঞ্জন বেরা; পশ্চিমবঙ্গের প্রেক্ষাপটে ভারতীয় গণনাট্য সংঘ : পর্ব থেকে পর্বান্তর, গণনাট্য প্রকাশনী, ২০১৭, পৃ- ২৩

৫৩। প্রাগুক্ত, মার্কসবাদী সাহিত্য বিতর্ক, পৃ- ঊনত্রিশ

- ৫৪। প্রাগুক্ত, বাংলার কমিউনিস্ট আন্দোলন : দলিল ও প্রাসঙ্গিক তথ্য, প্রথম খণ্ড, পূ- ১০৪
- ৫৫। প্রাগুক্ত, প্রসঙ্গ গণনাট্য, পৃ- ১৪৭
- ৫৬। প্রাগুক্ত, মার্কসবাদী সাহিত্য বিতর্ক, পৃ- চৌত্রিশ

৫৭। তদেব, পৃ- ছত্রিশ

৫৮। প্রাগুক্ত, পশ্চিমবঙ্গের প্রেক্ষাপটে ভারতীয় গণনাট্য সংঘ : পর্ব থেকে পর্বান্তর, পৃ- ২৪

৫৯। প্রাণ্ডক্ত, মার্কসবাদী সাহিত্য বিতর্ক, পৃ- সাইত্রিশ

৬০। প্রাগুক্ত, পশ্চিমবঙ্গের প্রেক্ষাপটে ভারতীয় গণনাট্য সংঘ : পর্ব থেকে পর্বান্তর, পৃ- ২৫

৬১। তদেব, পৃ- ২৯, ৩০

- ৬২। প্রাগুক্ত, গণনাট্য ৩ বর্ষ, জুলাই ও অক্টোবর ৬৭, শারদীয়া ১৩৭৪, পৃ- ২২
- ৬৩। হিরণকুমার সান্যাল; নাট্যকলা : নবান্ন, পরিচয়, কার্তিক, ১৩৫১
- ৬৪। মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য; নবান্ন, নভেম্বর দিবস বিশেষ সংখ্যা, জনযুদ্ধ পত্রিকা, ৮ নভেম্বর ১৯৪৪

৬৫। ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়; বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত, মডার্ন বুক এজেন্সি প্রাইভেট

লিমিটেড, ২০১২-১৩, পৃ- ৩০৬

৬৬। রামপ্রসাদ দে; গণনাট্যের প্রথম লেখক জ্যোর্তিময় সেনগুপ্ত; গণনাট্য : পঞ্চাশ বছর, বাবলু দাশগুপ্ত ও শিবশর্মা (সম্পাদনা), গণনাট্য সংঘ, ১৯৯৩, পৃ- ৭৬

৬৭। প্রাগুক্ত, মার্কসবাদী সাহিত্য বিতর্ক, পৃ- সাতাশ